بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ মোতাবেক ৩০ সুলাহ, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর খোদাপ্রেম বা ঐশী প্রেমের অগণিত ঘটনা রয়েছে; বরং তাঁর প্রত্যেক কর্ম এবং প্রতিটি ঘটনাই এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে যে, তাঁর হৃদয়ে সর্বদা খোদাপ্রেমের এক উত্তাল সমুদ্র বিরাজমান ছিল। এর একটি দৃশ্য আমরা উহুদের যুদ্ধেও দেখতে পাই, যেখানে তাঁর খোদাপ্রেমের ব্যাকুলতার এক অদ্ভুত ও অনন্য দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত বারা (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আমরা মুশরিক তথা পৌত্তলিকদের মুখোমুখি হই। মহানবী (সা.) তিরন্দাজদের একটি দল নিযুক্ত করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে তাদের নেতা মনোনীত করেন আর তাকিদ দিয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের স্থান থেকে সরবে না। যদি তোমরা দেখো যে, আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছি তবুও সরবে না। আর যদি দেখো, তারা আমাদের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে তবুও আমাদের সাহায্যের জন্য আসবে না। অর্থাৎ জয়-পরাজয় উভয় পরিস্থিতিতেই তোমরা তোমাদের (নির্ধারিত) স্থান ত্যাগ করবে না।

এখানে ঘটনার যে চূড়ান্ত রূপ রয়েছে তাতে তাঁর হৃদয়ে খোদাপ্রেমের কীরূপ উদ্দীপনা বা আবেগ ছিল তা ফুটে ওঠে। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমাদের মোকাবিলা হয় তখন শত্রু পালিয়ে যায়, এমনকি আমি মুশরিক নারীদেরকে এমন দিশেহারা অবস্থায় পাহাড়ের দিকে ছুটে পালাতে দেখি যে তাদের পায়ের গোছা থেকে কাপড় সরে যায় এবং তাদের পায়ের অলংকার দেখা যাচ্ছিল। মুসলমানরা (তখন) বলতে শুরু করে, গনিমতের মাল! গনিমতের মাল! হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) তাদের বাধা দেন। অর্থাৎ তার সাথে যে দলটি ছিল তাদের বাধা দেন এবং বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে তাকিদ দিয়েছিলেন, তোমরা সরবে না; কিন্তু তারা (এটি) মানে নি। তারা যখন গিরিপথ ছেড়ে গনিমতের মালের দিকে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'লাও সেই মুসলমানদের (দিক) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। [অর্থাৎ, গিরিপথ ত্যাগ করে লোকেরা যখন গনিমতের মাল সংগ্রহের জন্য চলে আসে, তখন আল্লাহ্ তা'লাও মুসলমানদের থেকে বিমুখ হন।] যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং শত্রু পুনরায় আক্রমণ করে আর সত্তরজন মুসলমান শহীদ হয়ে যান। তিনি বলেন, এসময় মহানবী (সা.) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে আরোহণ করে চিৎকার করে বলে, লোকদের মধ্যে কি মুহাম্মদ আছে? মহানবী (সা.) বলেন, তাকে উত্তর দিও না। এরপর সে বলে, এই লোকদের মাঝে ইবনে আবু কুহাফা (আবু বকর) আছে কি? তিনি (সা.) বলেন, উত্তর দিও না। এরপর সে বলে, এদের মাঝে উমর ইবনে খাত্তাব আছে কি? যখন কোনো উত্তর এলো না, তখন আবু সুফিয়ান বলে, এরা সবাই নিহত হয়েছে। যদি জীবিত থাকত তাহলে অবশ্যই উত্তর দিত।

(তখন) হযরত উমর (রা.) নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, ওরে আল্লাহ্‌র শত্রু! তুই মিথ্যা বলছিস। আল্লাহ্ তোর মোকাবিলায় তাঁকে জীবিত

রেখেছেন যিনি তোকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন আবু সুফিয়ান ধ্বনি উচ্চকিত করে বলে, হুবলের জয় হোক! সে যখন একথা বলে তখন মহানবী (সা.) ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং বলেন, তোমরা এর উত্তর দাও। সাহাবীগণ নিবেদন করেন, আমরা কী উত্তর দেবো? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা বলো, 'আল্লাহ্ সর্বমহান এবং সবচেয়ে সম্মানিত'। আবু সুফিয়ান বলে, আমাদের **উযযা** (প্রতিমা) আছে, কিন্তু তোমাদের কোনো **উযযা** নেই। মহানবী (সা.) বলেন, এর উত্তর দাও। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, কী বলব? তিনি (সা.) বলেন, বলো, 'আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী, কিন্তু তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই'।

অর্থাৎ, যেখানে আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমানের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং তাঁর ভালোবাসার প্রশ্ন ওঠে, সেখানে তিনি (সা.) নিজের প্রাণের প্রতিও কোনো ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তিনি (সা.) তাৎক্ষণিকভাবে সাহাবীদের উত্তর দেবার নির্দেশ দেন। পূর্বে যৌক্তিক কারণে উত্তর দেওয়া পছন্দ করেন নি।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও ইতিহাসের বরাত দিয়ে লিখেছেন, যেসব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর চারপাশে সমবেত ছিলেন এবং কাফিরদের প্রবল আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন, তারা কাফিরদের সরে যাওয়ামাত্রই আবার মহানবী (সা.)-এর চারপাশে সমবেত হন। [অর্থাৎ সাহাবীরা জড়ো হন, তাঁর (সা.) পবিত্র দেহ তারা তোলেন, কেননা তিনি (সা.) সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।] একজন সাহাবী (আবু) উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা.) নিজের দাঁত দিয়ে মহানবী (সা.)-এর মাথায় বিঁধে যাওয়া কিলক অত্যন্ত জোরে টেনে বের করেন, যার ফলে তার (অর্থাৎ আবু উবায়দার) দুটি দাঁত ভেঙে যায়। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.)-এর জ্ঞান ফিরে আসে। [যেমনটি আমি বলেছি, তিনি আঘাতের কারণে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন]। তাঁর জ্ঞান ফিরে আসার পর সাহাবীরা রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে [এই সংবাদ দিতে] লোক পাঠান যে, মহানবী (সা.) জীবিত আছেন, সবাই চলে আসো। [শত্রুপক্ষ এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর যে অংশটি ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, তারা আবার সমবেত হতে শুরু করে।] মহানবী (সা.) তাদের নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নেন। অবশিষ্ট বাহিনী যখন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করছিল তখন আবু সুফিয়ান অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের কথার কোনো উত্তর দেন নি, পাছে শত্রু প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়ে পুনরায় আক্রমণ করে বসে। অন্যথায় শত্রু বুঝে যাবে যে, মুসলমানরা মরে নি বরং আহত হয়েছে। যেহেতু মুসলমানরা আহত অবস্থায় আছে, তাই তারা পুনরায় আক্রমণ সইতে পারবে না এবং আহত মুসলমানরা আবার শত্রুর আক্রমণের শিকার হবে। ইসলামী সেনাদের পক্ষ থেকে এ কথার কোনো উত্তর না পেয়ে আবু সুফিয়ানের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, তার ধারণা সঠিক। সে সজোরে চিৎকার করে বলে, আমরা আবু বকরকেও হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কেও কোনো উত্তর না দেবার নির্দেশ দেন। এরপর আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলে, আমরা উমরকেও হত্যা করেছি। তখন হযরত উমর (রা.)– যিনি অত্যন্ত তেজস্বী মানুষ ছিলেন– এর উত্তরে বলতে চান যে, আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জীবিত আছি এবং তোমাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু মহানবী (সা.) বারণ করে বলেন, মুসলমানদের কষ্টে নিপতিত কোরো না বরং নীরব থাকো। [কারণ এখন দুর্বলতার মাঝে আক্রমণ করলে আরো বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।] এতে কাফিরদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকেও এবং তাঁর ডান

ও বাম হাতকেও আমরা হত্যা করে ফেলেছি। তখন আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীরা আনন্দের আতিশয্যে ধ্বনি উচ্চকিত করে যে, أُعْلُ هُبَلْ، أُعْلُ هُبَلْ (অর্থাৎ) আমাদের সম্মানিত প্রতিমা হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক, সে আজ ইসলামের যবনিকাপাত ঘটিয়েছে। সেই একই রসূল মহানবী (সা.)– যিনি নিজের মৃত্যুর ঘোষণায়, আবু বকরের মৃত্যুর ঘোষণায় এবং উমরের মৃত্যুর ঘোষণায় (এই আশঙ্কায়) নীরব থাকার পরামর্শ দিচ্ছিলেন– পাছে আহত মুসলমানদের ওপর কাফির বাহিনী পুনরায় আক্রমণ করে বসে এবং মুষ্টিমেয় মুসলমান তাদের হাতে শহীদ হয়ে যায়– এখন যখন এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র সম্মানের প্রশ্ন আসে এবং রণক্ষেত্রে শিরকের ধ্বনি উচ্চকিত করা হয়, তখন তাঁর আত্মা ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বলেন, বলো, اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ. اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ তোমরা মিথ্যা বলছ যে, হুবলের সম্মান উচ্চকিত হয়েছে। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌ই সম্মানিত এবং তাঁর মহিমাই সর্বোচ্চ, হুবলের নয়। আর এভাবেই তিনি (সা.) নিজের বেঁচে থাকার সংবাদও শত্রুদের কাছে পৌঁছে দেন।

কাফির বাহিনীর ওপর এই দুঃসাহসিক এবং বীরত্বপূর্ণ উত্তরের এত গভীর প্রভাব পড়েছিল যে, যদিও এই উত্তরের কারণে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলোয় মিশে গিয়েছিল এবং যদিও তাদের সামনে মুষ্টিমেয় আহত মুসলমান দাঁড়িয়ে ছিলেন– যাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করা জাগতিক নিয়মানুসারে একেবারেই সম্ভব ছিল– তবুও তারা পুনরায় আক্রমণ করার সাহস পায় নি। যেটুকু সাফল্য তারা লাভ করেছিল, তা নিয়েই আনন্দে বগল বাজাতে বাজাতে তারা মক্কায় ফিরে যায়।

মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি ভালোবাসায় শিরকের লেশমাত্রও ছোঁয়া লাগতে দিতেন না। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে বলে, যেমনটি আল্লাহ্‌ চান এবং আপনি চান। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহ্‌ তা'লার সমতুল্য আখ্যা দিলে? (এভাবে বলো না,) বরং এভাবে বলো যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ যা চান। শিরকের লেশমাত্রও থাকা উচিত নয়। কিছু মানুষ এ ধরনের কথা বলে ফেলে যে, 'আল্লাহ্‌ যেমনটি চান এবং আপনি যেমনটি চান'। হ্যাঁ, এটি বলা যেতে পারে যে, যেমনটি আল্লাহ্‌ তা'লা চান এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হয়। আর এর সাথে যদি তার দোয়াও থাকে, তবে বরকত হবে। দোয়ার সীমা পর্যন্ত তো ঠিক আছে, কিন্তু 'আপনি যেমনটি চান' কথাটি ভুল, কারণ মহানবী (সা.) এটিকে কঠোরভাবে অপছন্দ করেছেন।

তাঁর (সা.) এই চিন্তাও থাকত যে, লোকেরা কবরসমূহকে আবার সিজদার স্থানে পরিণত না করে! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ এরই বিপরীত আমল হচ্ছে। পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি, মুসলমানরা পীর-ফকিরদের কবর পূজা করে, সিজদা করে; অথচ তিনি (সা.) কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যে অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, অর্থাৎ জীবনের অন্তিম সময়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ তা'লা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন! তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যদি তিনি (সা.) একথা না বলতেন, তবে তাঁর কবর উন্মুক্ত রাখা হতো; কিন্তু আমি ভয় পাই, পাছে

এটিকে মসজিদে পরিণত করা হয়! এ কারণেই উন্মুক্ত স্থান রাখা হয় নি, যেন এটি ইবাদতের স্থানে পরিণত না হয়।

আজকাল তো সেখানে সরকার এর চারদিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে; রেলিং ও প্রাচীর রয়েছে যেন কোনো প্রকার শিরক প্রকাশ না পায়। এই কাজটি অন্তত তারা ভালো করেছে, কারণ এই শিরকের প্রতি তাঁর (সা.) তীব্র ঘৃণা ছিল।

আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের বর্ণনায় একটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আবি কা'ব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলে, আপনি আপনার প্রভুর বংশপরিচয় আমাদের বলুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ (সূরা আল-ইখলাস: ২-৩) অবতীর্ণ করেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি এক ও অদ্বিতীয়– যিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। কারণ এমন কোনো বস্তু নেই যা সৃষ্টি হবে অথচ তা মৃত্যুবরণ করবে না; আর এমন কোনো বস্তু নেই যা মৃত্যুবরণ করে অথচ তার কোনো উত্তরাধিকারী থাকে না। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাঁর কোনো উত্তরাধিকারীও থাকবে না আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর সদৃশ কেউ নেই, তাঁর কোনো সমতুল্য নেই এবং তাঁর মতো কেউই নেই।

তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের আলোচনা করা যায় এমন কোনো সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না এবং তাঁর প্রতিটি শব্দ থেকে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা প্রকাশ পেত। প্রতিটি মুহূর্ত এমন ছিল যে, যখনই তিনি কথা বলতেন তাঁর প্রতিটি শব্দ থেকে এটাই প্রকাশ পেত যে, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা তাঁর হৃদয়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আছে; বরং তাঁর অন্তর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং এটি ছাড়া সেখানে অন্য কোনো কিছুর স্থান নেই।

হযরত যায়েদ বিন খালিদ জুহানী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হুদাইবিয়ায় রাতে বৃষ্টি বর্ষিত হবার পর আমাদের ফজরের নামায পড়ান। যখন তিনি নামায শেষ করেন তখন উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা কি জানো তোমাদের মহাসম্মানিত ও মহাপ্রতাপান্বিত প্রভু কী বলেছেন? আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়ের অবস্থা জানেন; বৃষ্টি দেখে মানুষের মনে যে চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল তা আল্লাহ্ তা'লার জানা ছিল এবং তিনি তা মহানবী (সা.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষজন নিবেদন করে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন– আমার বান্দাদের মধ্যে কতকের প্রভাত হয়েছে আমার প্রতি ঈমান রাখা অবস্থায়, আর কতক ছিল অস্বীকারকারী। [অর্থাৎ লোকদের মাঝে এমন অনেকে ছিল যারা রাতের বৃষ্টি দেখে এভাবে ভোর করেছে যে, তাদের কতক ঈমানদার ছিল আর কতক অস্বীকারকারী ছিল।] যে এই কথা বলেছে যে, আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতে বৃষ্টি হয়েছে– সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী আর নক্ষত্রের (প্রভাবকে) অস্বীকারকারী। [সেই যুগে নক্ষত্রেরও পূজা করা হতো এবং তরবিয়ত বা শিক্ষাদীক্ষাও কম ছিল। অনেক মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেছিল যারা পূর্বে নক্ষত্রের পূজা করত। কেউ কেউ বলে ফেলত, অমুক নক্ষত্রের কারণে আজ বৃষ্টি হয়েছে।] সুতরাং যে বলেছে আজ নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের ওপর ঈমান আনয়নকারী। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! যেভাবে তুমি আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পূর্ণ

উপলব্ধি রাখো, তেমনি তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরও বলে দাও, কতটা সূক্ষ্মতার সাথে তোমাদের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ এবং তাঁর ভালোবাসার কথা স্বীকার করা উচিত এবং হৃদয়ের গভীর থেকে এর প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিত।

হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! জান্নাত ও জাহান্নামকে ওয়াজিব বা অনিবার্যকারী দুটি বিষয় কী কী? তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে নি– সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করত– সে আগুনে প্রবেশ করবে। সুতরাং আজও শিরক কী মর্মে প্রশ্নকারীর জন্য এই উত্তর যথেষ্ট। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বর্ণনা করেছেন যে, উপকরণের ওপর ভরসা করা, নিজের ওপর ভরসা করা, নিজের যোগ্যতার ওপর ভরসা করা, নিজের ধনসম্পদের ওপর ভরসা করা, নিজের বংশ ও গোত্রের ওপর ভরসা করা, নিজের সন্তানের ওপর ভরসা করা– মোটকথা এমন যে-কোনো বস্তু যার ওপর মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে অগ্রগণ্য না রেখে এবং আল্লাহ্ তা'লার নাম না নিয়ে ভরসা করে, সে শিরকের অপরাধে অপরাধী হয়। অতএব, এই সূক্ষ্মতার সাথে আমাদের সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যেন আমরা শিরক এড়িয়ে চলতে পারি, এর ওপর আমল করি এবং আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি করতে থাকি।

এরপর আরো গভীর সূক্ষ্মতার নিরিখে এক জায়গায় তিনি (আ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মাহমুদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটির ভয় করি তা হলো 'শিরক-এ-আসগর' (ছোটো শিরক)। সাহাবীগণ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! শিরক-এ-আসগর কী জিনিস? তিনি (সা.) বলেন, 'রিয়া' তথা লোক-দেখানো ইবাদত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, যাদের দেখানোর জন্য তোমরা পৃথিবীতে লোক-দেখানো কাজ করতে, তাদের কাছেই যাও এবং দেখো, তোমরা তাদের কাছে কোনো প্রতিদান পাও কি না। তোমরা তো কিছু কাজ তাদের দেখানোর জন্যই করতে, তাই তাদের কাছ থেকেই প্রতিদান নিয়ে নাও। সুতরাং লোক-দেখানো ইবাদত ও রিয়া– অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর জন্য কৃত্রিম নীতি ও ভণ্ডামি– এই বিষয়গুলো আল্লাহ্ তা'লার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়; কারণ সেই কাজগুলো তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করছ না, বরং লোক-দেখানোর জন্য, সেই মানুষদের খুশি করার জন্য করছ। এরূপ গভীরতার সাথে আমাদেরও আত্মপর্যালোচনা করা উচিত যে, আমাদের আমলসমূহ কেমন; কারণ পরকালে এ ধরনের কোনো মাধ্যম বা ওসীলা কাজে আসবে না। কেবল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহই কাজে আসবে এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণ আর তাঁর আনুগত্য ও অনুগমনই হলো প্রকৃতপক্ষে কাজে আসার মতো বস্তু, যা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পছন্দ করেছেন। কারণ আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (সূরা আল-ইমরান: ৩২) অর্থাৎ তাঁর (সা.) মাধ্যমে এই ঘোষণা করিয়েছেন যে, মানুষকে বলে দাও– যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদের ভালোবাসবেন।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব তিনি এভাবে নিয়েছেন যে, আমি হয় তাকে সেই পুরস্কার অথবা তার অর্জনকৃত যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ তাকে ফেরত প্রেরণ করব, নতুবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। [অর্থাৎ হয় সে বিজয় লাভ করবে, অথবা শহীদ হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।] তবে শর্ত হলো– আমার প্রতি ঈমান ও আমার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসই যেন তার জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবার মূল কারণ হয়। [শর্ত হচ্ছে, ঈমান দৃঢ় হতে হবে, আল্লাহ্র রসূলের অনুসরণ ও বয়আতের শর্ত পালন করে জিহাদের জন্য বের হতে হবে।] [মহানবী (সা.) বলেন,] আর আমি যদি উম্মতকে কষ্টের মুখে ঠেলে দেবার আশঙ্কা না করতাম তবে আমি প্রতিটি সেনাদলের সাথে যেতাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হলো– আমি আল্লাহ্র পথে শহীদ হই, এরপর আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, তারপর আবার শহীদ হই। [মহানবী (সা.) নিজ আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন।]

বুখারীর এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত সৈয়্যদ ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রহ.) লেখেন, মহানবী (সা.)-এর সেই বাণী لو لا ان اشق على امتى অর্থাৎ, আমি যদি এ আশঙ্কা না করতাম যে, আমার উম্মত কষ্টে নিপতিত হবে, তাহলে আমি এরূপ করতাম– এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মহানবী (সা.) ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিলেন– সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন। [তাদের অধিকাংশই মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করতে চাইতেন এবং করতেনও বটে।] মহানবী (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শে এতটা আকর্ষণ শক্তি ও প্রভাব ছিল যে, মহানবী (সা.) নিজে কিছু করতে গিয়ে নিজ উম্মতের কথা ভাবতেন– পাছে তাঁর কোনো কাজ তাদের জন্য এমন হয়ে যায় যা তাদেরকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবে। অর্থাৎ, তিনি যদি সব কিছু আবশ্যকীয় করে দেন তবে উম্মত কষ্টে পড়ে যাবে। এ কারণে তিনি (সা.) বলেছেন, আমি কখনও কখনও এজন্য (জিহাদে) যাই না, পাছে তোমরা কষ্টে নিপতিত হও।

সৈয়দ ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব আরো লেখেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর অগাধ ভালোবাসা ছিল। যেমন বিরুদ্ধবাদীরাও **"আশিকা মুহাম্মাদুন রাব্বাহু"** বাক্যের মাধ্যমে সেই ভালোবাসার উল্লেখ করত। কিন্তু সেই ভালোবাসার সাথে তাঁর (সা.) নিজ মনের ওপর নিয়ন্ত্রণও ছিল এবং তাঁর বিবেক এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করে নি। যারা নিজেদের বিভিন্ন কাজে বাড়াবাড়ি করে, তাদের জন্য এতে এক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। অন্ধভাবে নিজের আবেগের পিছনে ছুটে চলা কারো পূর্ণ ঈমানের লক্ষণও নয়, আর কোনো উচ্চস্তরের পুণ্য কাজও নয়। কেউ কেউ বলে, আমাদের আত্মাভিমান রয়েছে, আমাদের অমুক অমুক কাজ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা মধ্যমপন্থা পছন্দ করেন। মধ্যমপন্থার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকাই পুণ্যের পরাকাষ্ঠা। কেননা, এতে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। সুতরাং এখানে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামও আছে আর আল্লাহ্র ভালোবাসাও আছে। উভয় বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখে কাজ করতে হবে, অন্ধ আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে না। মহানবী (সা.) নিজের উত্তম আদর্শ স্থাপন করে আমাদের এমন এক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যেখানে আল্লাহ্র ভালোবাসার পরাকাষ্ঠাও বিদ্যমান, নিজের ইচ্ছা ও বাসনা প্রকাশেরও পরম রূপ দেখা, আর আত্মত্যাগেরও পরম বহিঃপ্রকাশ রয়েছে।

কিন্তু পাশাপাশি বিবেক ও মধ্যম পন্থাও অবলম্বন করতে দেখা যায়, কেননা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো অবলম্বন করো।

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) মুশরিকদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়াকে খুবই অপছন্দ করতেন। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন আর 'হার্‌রাতুল ওয়াবারা' নামক স্থানে পৌছেন যা মদীনার পশ্চিমে তিন মাইল দূরে অবস্থিত, তখন তিনি একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পান যার সাহসিকতা ও বীরত্ব সর্বজনস্বীকৃত ছিল, সে এক বীরপুরুষ ছিল। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তাকে দেখামাত্র (এই ভেবে) অত্যন্ত আনন্দিত হন যে, সে এখন আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। যখন সে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন জানায়, আমি আপনার সফরসঙ্গী হবার, আপনার সাথে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ লাভের ও আপনাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এসেছি। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখ? সে বলে, না। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে ফেরত চলে যাও, কেননা আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নেবো না। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, সে চলে যায়। এরপর যখন আমরা 'শাজারা' পৌঁছাই অর্থাৎ সে গাছের নিকট পৌঁছাই যা মদীনা থেকে সাত মাইল দূরে যুল হুলাইফায় অবস্থিত, যে স্থানে মহানবী (সা.) ইহরাম বাঁধতেন– সেখানে সেই ব্যক্তি পুনরায় মহানবী (সা.)-এর নিকট আসে। সে মহানবী (সা.)-কে পেয়ে সেভাবেই নিবেদন জানায় যেভাবে প্রথমবার নিবেদন জানিয়েছিল। মহানবী (সা.) তাকে সেই উত্তরই প্রদান করেন যে উত্তর প্রথমবার দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, ফেরত চলে যাও; আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। সে পুনরায় ফেরত চলে যায় আর মহানবী (সা.)-এর সাথে 'বায়যা' নামক স্থানে গিয়ে সাক্ষাৎ করে যা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী যুল হুলাইফার পর অবস্থিত। যাহোক, সেখানে তিনি (সা.) তাকে পুনরায় সে কথাই বলেন যা পূর্বে বলেছিলেন যে, তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ? তিনি তখন বলেন, জি হ্যাঁ। তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, এখন চলো; এখন তুমি আমাদের সাথে যেতে পারো। সুতরাং অবস্থা যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা ও আত্মাভিমান যা (তাঁর মাঝে) বিদ্যমান ছিল, তার কারণে কোনো মুশরিকের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করাটা তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। বিশেষত সে কাজে যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির ও ধর্মীয় স্বার্থে করা হচ্ছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করো, কতটা প্রজ্ঞা ছিল ও কতটা সতর্ক থাকতেন! কীভাবে খোদাভীতি লালন করতেন! অথচ তিনি সমস্ত মানবজাতি অপেক্ষা পরিপূর্ণ (মানব) ছিলেন এবং তিনি সকল প্রকার পাপের ঊর্ধ্বে ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, কিন্তু এ পবিত্রতা ও শুচিতা সত্ত্বেও লক্ষ করো, তাঁর মাঝে সর্বদা খোদাভীতি কাজ করত। তিনি (সা.) অবিরাম পুণ্যকাজে রত থাকতেন, সর্বোত্তম মানের কাজ সম্পাদন করতেন। অবিরাম একের পর এক পুণ্যকাজে রত থাকতেন, কখনো কোনো মন্দকাজ সংঘটিত হবার প্রশ্নই ছিল না, মন্দের লেশমাত্রও ছিল না। উত্তম থেকে উত্তম কাজ সম্পাদন করতেন। সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার উপাসনায় রত থাকতেন। এ সত্ত্বেও সর্বদা ভীত থাকতেন। নিজের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি থাকত খোদার অমুখাপেক্ষিতা তথা ভ্রূক্ষেপহীনতার ওপর। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ লক্ষ্য করতেন তখন অমুখাপেক্ষী

আল্লাহ্‌র সামনে নিজের সকল কাজকে অর্থহীন জ্ঞান করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে ইস্তেগফার করতেন আর সুযোগ পাওয়ামাত্রই তওবা করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

অর্থাৎ আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি দৈনিক আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজ দুর্বলতার মার্জনার জন্য সত্তরেরও অধিকবার ক্ষমাপ্রার্থনা করি ও তাঁরই সমীপে বিনত হই। আরবী ভাষায় এ সত্তর শব্দটি অগণিত অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ অগণিতবার এটি করি। খোদাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখুন, প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর (সা.) পবিত্র জিহ্বা যিকরে ইলাহীতে সিক্ত থাকত। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সর্বাবস্থায় যিকরে ইলাহীতে রত থাকতেন, যেমনটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও বর্ণনা করেছেন। আর হাদীসসমূহ থেকেও এটি সাব্যস্ত হয় যে, তাঁর (সা.) জিহ্বা প্রতিটি মুহূর্ত যিকরে ইলাহীতে সিক্ত থাকত। হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, চারটি কথা সকল কথার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; এগুলোর যেটির মাধ্যমে তুমি শুরু করো তোমার এতে কোনো ক্ষতি নেই। এই কথাগুলোর মাধ্যমে যদি তুমি কাজ শুরু করো তাহলে তা সর্বোত্তম ও অত্যন্ত কল্যাণমণ্ডিত। সেগুলো কী? প্রথম হলো সুবহানাল্লাহ্, দ্বিতীয় আলহামদুলিল্লাহ্, তৃতীয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, চতুর্থ আল্লাহু আকবার। অর্থাৎ, আল্লাহ্ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

সুতরাং এগুলো এমন বিষয়, যদি এগুলো সর্বদা মানুষের মনে থাকে এবং সর্বদা যদি এসবের প্রতি মনোযোগ থাকে; কথা বলার সময় অথবা কাজ করার সময় এসব বিষয় যদি সম্মুখে রাখে, তাহলে এতে সর্বৈব কল্যাণ রয়েছে।

অনুরূপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন বিসর (রা.) বর্ণনা করেন, একজন গ্রাম্য লোক মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, ইসলামের নিয়মকানুন এবং পুণ্যকর্ম আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে; অর্থাৎ এত বিধিবিধান এবং পুণ্যের কথা রয়েছে যে, আমার মতো মানুষের জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। মরুবাসী ছিল, তারা এমন প্রশ্ন করে ফেলত। সে বলে, আপনি এসবের মধ্য থেকে কোনো এমন বিষয় বলে দিন যেন আমি সেটির প্রতি গুরুত্ব দিই এবং সেটাই বেশি বেশি পালন করি। তিনি (সা.) বলেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে রত থাকে; তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে রত রাখ। তিনি (সা.) বলেন,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে রত থাকে। অপর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, সর্বোত্তম যিকর হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', আর সর্বোত্তম দোয়া হলো 'আলহামদুলিল্লাহ্'। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার সম্মুখে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তিনি আমার জন্য বাতহা উপত্যকা অর্থাৎ মক্কাকে স্বর্ণের বানিয়ে দেবেন। আমি নিবেদন করি, হে আমার প্রভু! আমি বরং এটা চাইব যে, একদিন পেট ভরে খাবার খাব এবং একদিন ক্ষুধার্ত থাকব। যখন আমি ক্ষুধার্ত থাকব সেদিন তোমার দরবারে আহাজারি করব এবং তোমাকে স্মরণ করব,

আর যখন আমি তৃপ্তির সাথে খাবার খাব তখন তোমার প্রশংসা করব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আমার এসবের প্রয়োজন নেই। সর্বদা তোমাকে স্মরণ রাখাই আমার কাম্য। স্বর্ণ ও ধনসম্পদ বেশি হয়ে গেলে পাছে এমন হয় যে, আমি তোমার স্মরণবিমুখ হয়ে যাই!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মহানবী (সা.) যে কষ্ট ও কাঠিন্য সহ্য করেছিলেন বা এভাবে বলা উচিত যে, আর্থিকভাবে যদি তাঁর অবস্থা দুর্বল হয়ে থাকে, তবে তা একারণে নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দেন নি। আল্লাহ্ তা'লা অঢেল দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও স্মরণে তিনি দারিদ্র্যের জীবন অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) নিয়ামতরাজি অস্বীকারও করতেন না। রান্না করা ভালো খাবার আহার করতেন এবং এসবের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

একইভাবে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বাকরা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে যখন কোনো আনন্দের কারণ সামনে আসত, তাঁকে কোনো সুসংবাদ শোনানো হতো, তখন তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদাবনত হতেন। আল্লাহ্ তা'লার কাছেই সকল কৃতজ্ঞতা, তাঁরই ভালোবাসা ও প্রশংসার দাবি আর তাঁরই দাসত্বের দাবি হলো, তাঁর সম্মুখে তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়া এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তুমি নিজের বিছানায় যাবার পূর্বে ওযু করে নাও। [নামাযের জন্য নিজের ওযু করার ন্যায় শোয়ার পূর্বে ওযু করা উত্তম বিষয়।] এরপর ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়ো এবং দোয়া পড়ো। আমি দোয়াগুলোর অনুবাদ পড়ছি যা নিম্নরূপ:

হে আল্লাহ্! আমি নিজেকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। আমি আমার কাজগুলো তোমার হাতে সঁপে দিলাম এবং তোমাকে নিজের আশ্রয়স্থল বানালাম– তোমাকে ভয় করে এবং তোমার প্রতি ভালোবাসা রেখে। তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং কোনো মুক্তিস্থলও নেই। মুক্তি কেবল তোমারই হাতে। আমি তোমার সেই কিতাবের ওপর ঈমান আনলাম যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার সেই নবীর ওপর ঈমান আনলাম যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ। মহানবী (সা.) বলেছেন, এই দোয়াটি করে যদি তুমি সেই রাতে মৃত্যুবরণ করো তবে তুমি 'ফিতরত' (তথা ইসলাম)-এর ওপর মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং এই বাক্যগুলোকে তোমার শেষ উক্তি বানাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আমি এই শব্দগুলো মুখস্থ করে নেবো এবং আমি দোয়াটি পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে 'ওয়া বিরাসূলিকাল্লাযী আরসালতা' বাক্যটিও যোগ করে বললাম, আমি এই বাক্যটিও অন্তর্ভুক্ত করব, অর্থাৎ 'এবং তোমার সেই রসূলের ওপরও যাকে তুমি পাঠিয়েছ'। এতে মহানবী (সা.) বলেন, না, বরং তুমি এটি বলো– 'ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা' অর্থাৎ 'এবং তোমার সেই নবীর ওপরও যাকে তুমি পাঠিয়েছ– আমি তাঁর ওপর ঈমান আনি'।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) মৃত্যুর বিষয়ে কোনো সময়ই উদাসীন থাকতেন না এবং আল্লাহ্‌র ভয় তাঁর ওপর এতটাই প্রবল ছিল যে, প্রতিদিন এই বিশ্বাস নিয়ে ঘুমাতেন– হয়ত আজই মৃত্যু এসে যাবে এবং আজই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। এই কারণে তিনি (সা.) এমন এক মুসাফিরের মতো থাকতেন যার খেয়াল থাকে যে, ট্রেন এখনই ছাড়বে; সে কখনো নিজেকে এমন কাজে জড়ায় না যা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ট্রেনে উঠতে হবে– তাই এমন যেন না হয় যে, দেরি হয়ে যায় বা ট্রেন ছেড়ে যায়; তাই সে গাড়ির অপেক্ষায় থাকে। মহানবী (সা.)-ও প্রতি মুহূর্তে

নিজের প্রিয়তমের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন এবং যে মুহূর্তটি অতিক্রান্ত হতো তাকে তাঁর ফযল বা অনুগ্রহের ফল মনে করতেন এবং মৃত্যুকে স্মরণ রাখতেন।

হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি বিছানায় শুতেন তখন নিজের গালের নীচে হাত রাখতেন এবং বলতেন, بِاسْمِكَ رَبِّ أَمُوتُ وَأَحْيَا 'হে আমার প্রভু! তোমারই নামে আমি মরি এবং তোমারই নামে জীবিত হই।' আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর (তথা নিদ্রার) পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁরই দিকে পুনরুত্থান বা ফিরে যেতে হবে।'

এই ঘটনা থেকে জানা যায়, তিনি (সা.) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন নিজের পক্ষ থেকে (জীবনের) হিসাব চুকিয়ে যেতেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতেন, যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তবে যেন তোমারই নামে আমার জীবন (বা মৃত্যু) হয়; আর যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর গুণকীর্তন করতেন যে, আমি তো নিজের পক্ষ থেকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম; এটি তোমারই অনুগ্রহ যে, তুমি পুনরায় আমাকে জীবিত করেছ এবং আমার আয়ু বা জীবন দীর্ঘ করেছ। যেভাবে প্রথম দোয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.) প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে স্মরণে রাখতেন, ঠিক একইভাবে এই দোয়াটিও এই বিষয়ের সাক্ষী।

আরো একটি দোয়া রয়েছে; তিনি (সা.) নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে শেষ মুহূর্ত মনে করতেন এবং যখন ঘুমাতে যেতেন তখন নিজ প্রভুর সাথে নিজের বিষয়াদির মীমাংসা করে নিতেন, অর্থাৎ প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন। যেমনটি হযরত বারা বিন আযেব (রা.)-র রেওয়ায়েতে রয়েছে; তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন নিজের বিছানায় গিয়ে শুতেন তখন ডান পাশ ফিরে শুতেন, অতঃপর বলতেন:

হে আমার প্রভু! আমি আমার প্রাণ তোমার কাছে সমর্পণ করছি। আমি আমার পূর্ণ মনোযোগ তোমার প্রতি নিবদ্ধ করছি। আমি আমার সকল বিষয় তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি এবং নিজেকে তোমার আশ্রয়ে সঁপে দিচ্ছি। তোমার কাছেই আমি কল্যাণের আশা রাখি এবং তোমার মহত্ত্ব ও অমুখাপেক্ষিতার বিষয়ে ভীতও বটে। তোমার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং তোমার কাছেই মুক্তি ও আশ্রয় প্রার্থনা করা ছাড়া কোনো নাজাত বা মুক্তির স্থান নেই। আমি সেই কিতাবের ওপর ঈমান আনি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং সেই রসূলের ওপরও যাকে তুমি পাঠিয়েছ।

এই দোয়াটি তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, আর তিনি নিজেও অত্যন্ত নিয়মিত এই দোয়া করতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, মানুষ নিজের দোকান বন্ধ করার সময় ঠিকই এর হিসাব মিলিয়ে নেয়, অর্থাৎ ব্যবসায়ী লোকজন রাতের বেলা ঠিকই আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে তারপর ঘুমাতে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যে হিসাব তা মানুষ পরিষ্কার করে না; সেই বিষয়ে মানুষ উদাসীন থাকে। কিন্তু কী অসাধারণ সেই মনোনীত ব্যক্তি– যিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে মশগুল থাকতেন! শুধু নিজেই পালন করতেন না, বরং হাজারো মানুষের নিগরানি করতেন যে, তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন কি না। আর রাতে ঘুমানোর আগে নিজের সমস্ত চেষ্টাসংগ্রাম ও ইবাদতকে অর্থহীন জ্ঞান করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিজ প্রভুর সামনে নিজের হিসাব মেলানোর জন্য এমনভাবে দাঁড়াতেন যেন তিনি কিছুই করেন নি। আর তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত

ঘুমাতেন না যতক্ষণ না সম্পূর্ণভাবে নিজের প্রাণ আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে, জগৎ ও জগতের সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিতেন এবং আল্লাহ্‌র হাতে নিজেকে তুলে না দিতেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, ফজরের নামায থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যারা আল্লাহ্‌র যিকরে রত থাকে, তাদের সঙ্গে বসা আমার কাছে হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে চারজন দাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়। আর আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যারা আল্লাহ্‌র যিকরে মশগুল থাকে, তাদের সঙ্গে বসে থাকাও আমার কাছে চারজন দাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়। আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি ভালোবাসার কারণে যারা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে– এমন মানুষ ও তাঁর যিকরকারীদেরকে তিনি হযরত ইসমাঈলের সন্তানদের, নিজের আত্মীয়স্বজন ও নিকটজনদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এদের সবার দাসত্ব তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল, কিন্তু (যিকরকারীদের সাথে) এ বিচ্ছেদ সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এটা কীভাবে সম্ভব যে, কোথাও আল্লাহ্‌র যিকর হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, আর আমি সেই মজলিস থেকে দূরে চলে যাব! সুবহানাল্লাহ্‌! ঐশী প্রেমের কী অতুলনীয় মহিমা– যা তিনি মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি করতেন এবং তাঁর অন্তরেও যা ছিল পরম পর্যায়ে। এরপর নিজের অনুসারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, তোমরা সবসময় আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও তাঁর যিকরে রত থাকো। মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো– যিকরে ইলাহীতে রত থাকা অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসা। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি আমলের কথা বলব না, যা তোমাদের প্রতিপালক-প্রভুর নিকট সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধিকারী, তোমাদের জন্য সোনা-রুপা খরচ করার চেয়েও উত্তম, এমনকি শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করার চেয়েও উত্তম– যখন তোমরা তাদের হত্যা করো বা তারা তোমাদের হত্যা করে? [অর্থাৎ শত্রুর সাথে যুদ্ধ হয় কিংবা তাদের মুখোমুখি হতে হয়, রক্তপাত অথবা যুদ্ধ সংঘটিত হয়– যেটিকে তোমরা জিহাদ নামেই আখ্যায়িত করো না কেন;] এটি সেসব বিষয়ের চেয়েও উত্তম যা আমি তোমাদের বলছি। সাহাবীরা (রা.) বলেন, কেন নয়? আজকাল তো কিছু মুসলমান বলে থাকে, জিহাদই সর্বোত্তম আমল। শত্রুর শিরশ্ছেদ করার কথা বললেও বাস্তবে তারা নিজেদের লোকদেরই হত্যা করছে, যা সবচেয়ে বড়ো পাপ। যাহোক, এখানে মহানবী (সা.) বলছেন, এর চেয়েও উত্তম বিষয়ের কথা আমি তোমাদেরকে বলছি। তিনি (সা.) বলেন, তা হলো আল্লাহ্‌র যিকর। আল্লাহ্‌র যিকর করো; এটি সব জিহাদের চেয়েও বড়ো জিহাদ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তথাকথিত জিহাদের অভিযোগও আনা হয়, কিন্তু ইসলামের মূল শিক্ষা তো এটাই। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র যিকরের চেয়ে আর কোনো কিছু আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বেশি মুক্তি দানকারী নেই। আল্লাহ্‌র যিকর করা হলে তিনি বহু শাস্তি ও বিপদ থেকে তোমাদের মুক্ত করবেন। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার কারণেই মহানবী (সা.)-এর কাছে সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকর ছিল সবচেয়ে প্রিয়। এ সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে; হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার নিকট সুবহানাল্লাহ্‌ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পবিত্র), আলহামদুলিল্লাহ্‌ (অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়), আল্লাহু

আকবার (অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) পাঠ করা জগতের সবকিছুর চেয়েও অধিক প্রিয়। এটি এমন এক ঐশী প্রেম-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, জীবনের শেষ মুহূর্তেও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ঠোঁটে তাঁর সেই সত্যিকার প্রেমাস্পদের নামই উচ্চারিত হচ্ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন সুস্থ ছিলেন তখন তিনি প্রায়ই বলতেন, কোনো নবীর ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু হয় না যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে নিজ ঠিকানা দেখে নেন। এরপর তাকে পৃথিবীতে থাকা বা আল্লাহ্‌র কাছে চলে যাবার মধ্য থেকে যে-কোনো একটি বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো এবং তাঁর পবিত্র শির আমার উরুর ওপর রাখা ছিল, তখন তাঁর ওপর কিছুটা সময়ের জন্য অচেতনতার (বা মূর্ছার) ভাব লক্ষ করা গেল। এরপর যখন তাঁর চেতনা ফিরল, তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকালেন এবং বললেন, اللهُمَّ الرَّفِيقَ الأعلى অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! হে সর্বোচ্চ সুমহান বন্ধু!' [হযরত আয়েশা বলেন,] তখন আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি এখন আর আমাদের সুযোগ দেবেন না। তাঁর (সা.) একথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, তিনি এখন আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম, এটি সেই কথাই যা তিনি সুস্থ অবস্থায় আমাদের বলতেন; অর্থাৎ আমাকে এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তাই এখন আমি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাচ্ছি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) শেষ যে কথাটি বলেন তা ছিল – اللهُمَّ الرَّفِيقَ الأعلى।

অন্য এক স্থানে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার ওপর আল্লাহ্‌র অন্যতম অতুলনীয় নিয়ামত হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার বুক ও কণ্ঠাস্থির মাঝখানে হেলান দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তে আমার লালা, তাঁর লালার সাথে মিশ্রিত করেছিলেন। এর বিস্তারিত তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন: আব্দুর রহমান আমার ঘরে আসেন, তার হাতে একটি মেসওয়াক ছিল। মহানবী (সা.) আমার গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমি লক্ষ করলাম, তিনি (সা.) সেটির দিকে তাকাচ্ছেন। আমি জানতাম, তিনি মেসওয়াক পছন্দ করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আপনার জন্য এটি নেবো? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। আমি তা নিয়ে তাঁকে দিলাম, কিন্তু সেটি তাঁর জন্য কিছুটা শক্ত ছিল। আমি বললাম, আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দেবো? তিনি পুনরায় ইশারায় সম্মতি দিলেন। তখন আমি সেটিকে নরম করে দিলাম। [অর্থাৎ মুখে নিয়ে চিবিয়ে মেসওয়াকটি নরম করে দেন।] সে সময় তাঁর সামনে পানির ছোটো একটি পাত্র ছিল বা বড়ো পাত্র ছিল। [পাত্রের আকারের বিষয়ে বর্ণনাকারীর সংশয় রয়েছে।] যাহোক, মহানবী (সা.)-এর সামনে পানির একটি পাত্র ছিল। তিনি (সা.) নিজের হাত পানিতে ডোবাচ্ছিলেন আর নিজের পবিত্র মুখমণ্ডলের ওপর বুলিয়ে বলছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ইন্না লিল-মাওতি সাকারাত' অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে'। এরপর তিনি (সা.) নিজের হাত তোলেন ও বলতে থাকেন, فِي الرَّفِيقِ الأعلى অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ সুমহান বন্ধুর পানে'। এই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায় এবং তাঁর হাত নুয়ে পড়ে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা শেষ সময়ে মহানবী (সা.)-কে এই অবকাশ দিয়েছিলেন যে, তুমি চাইলে পৃথিবী থাকতে পারেন অথবা চাইলে আমার

সান্নিধ্যে চলে আসতে পারো। তিনি বিনীতভাবে বলেন, হে আমার প্রতিপালক! এখন আমি তোমার কাছেই ফিরে আসতে চাই। আর তাঁর (সা.) উচ্চারিত শেষ বাক্যটি– যা উচ্চারণ করে তাঁর পবিত্র জীবনের সমাপ্তি ঘটে– সেটি ছিল بِالرَّفِيقِ الأعلى– অর্থাৎ আমি এখন এই পৃথিবীতে থাকতে চাই না, বরং আমার প্রতিপালক-প্রভুর কাছে চলে যেতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দেন যে, যদি জীবিত থাকার বাসনা থাকে তবে তা-ই হবে; কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, আমি এখন আর এ পৃথিবীতে থাকতে চাই না। এভাবেই তিনি আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্যে চলে যান, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)